উলঙ্গ রাজা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আগুনের দিকে

রাস্তাগুলি ক্রমে আরও তপ্ত হয়।
স্বজন, সঙ্গীর সংখ্যা
ক্রমে আরও কমে আসে।
হাতের মুদ্রায় তবু জাইয়ে রেখেছ বরাভয়
হাওয়ার ভিতরে তবু ভাসে
তোমার সৌরভ।
আর তাই
চতুর্দিকে ছত্রাকার ধড়মুণ্ড-আলাদা-করা শব
দেখেও আমাকে
এগিয়ে যেতেই হয়, আগুনের দিকে
এগিয়ে যেতেই হয়।

উলঙ্গ রাজা

সবাই দেখছে যে, রাজা উলঙ্গ, তবুও
সবাই হাততালি দিচ্ছে।
সবাই চেঁচিয়ে বলছে; শাবাশ, শাবাশ!
কারও মনে সংস্কার, কারও ভয়;
কেউ-বা নিজের বুদ্ধি অন্য মানুষের কাছে বন্ধক দিয়েছে;
কেউ-বা পরান্নভোজী, কেউ
কৃপাপ্রার্থী, উমেদার, প্রবঞ্চক;
কেউ ভাবছে, রাজবস্ত্র সত্যিই অতীব সূক্ষ্ম , চোখে
পড়ছে না যদিও, তবু আছে,
অন্তত থাকাটা কিছু অসম্ভব নয়।

গল্পটা সবাই জানে।
কিন্তু সেই গল্পের ভিতরে
শুধুই প্রশস্তিবাক্য-উচ্চারক কিছু
আপাদমস্তক ভিতু, ফন্দিবাজ অথবা নির্বোধ
স্তাবক ছিল না।
একটি শিশুও ছিল।
সত্যবাদী, সরল, সাহসী একটি শিশু।

নেমেছে গল্পের রাজা বাস্তবের প্রকাশ্য রাস্তায়।
আবার হাততালি উঠছে মুহুর্মুহু;
জমে উঠছে
স্তাবকবৃন্দের ভিড়।

কিন্তু সেই শিশুটিকে আমি
ভিড়ের ভিতরে আজ কোথাও দেখছি না।

শিশুটি কোথায় গেল? কেউ কি কোথাও তাকে কোনো
পাহাড়ের গোপন গুহায়
লুকিয়ে রেখেছে?
নাকি সে পাথর-ঘাস-মাটি নিয়ে খেলতে খেলতে
ঘুমিয়ে পড়েছে
কোনো দূর
নির্জন নদীর ধারে, কিংবা কোনো প্রান্তরের গাছের ছায়ায়?
যাও, তাকে যেমন করেই হোক
খুঁজে আনো।
সে এসে একবার এই উলঙ্গ রাজার সামনে
নির্ভয়ে দাঁড়াক।
সে এসে একবার এই হাততালির ঊর্ধ্বে গলা তুলে
জিজ্ঞাসা করুক:
রাজা, তোর কাপড় কোথায়?

কবিতা '৭০

এক-একটা কবিতা যেন সুতানুটি-গোবিন্দপুরের
রাত্রিকে ফিরিয়ে আনে।
এক-একটি কবিতা যেন অকস্মাৎ
টান্ মেরে হটিয়ে দেয় ময়দানের সবুজ গালিচা।
গঙ্গাসাগরের দিকে অগ্রসরমান যাত্রিবোঝাই নৌকাকে
এক-একটি কবিতা যেন রমনীর নখে, ওষ্ঠে, জঙ্ঘাদেশে, হাতের মুদ্রায়

বিষাক্ত ফুলের মতো ফোটে।
এক-একটি কবিতা যেন ঝড়ের ভিতরে হয়ে ওঠে
নিয়তির কণ্ঠস্বর।

কয়েকটা দিনের জন্য মফস্বল-বাংলায় সফর
সেরে নিয়ে
কবিতা আবার এই নগরের কেন্দ্রে ফিরে আসে।
দুলে ওঠে ঘর-দুয়ার।
যাদুঘর, রঙ্গালয়, ফুটবল-গ্যালারি, স্কাইস্ক্রেপারের পাশে
এক-একটি কবিতা গিয়ে হানা দেয়, আর
আতঙ্ক ঘনিয়ে ওঠে চারিধারে।
এক-একটি কবিতা গিয়ে ফেটে পড়ে চৌরঙ্গিপাড়ায়।
বৃক্ষেরা আমূল কাঁপে, ভয়ার্ত পাখিরা
ঝাঁকে-ঝাঁকে
বিপন্ন আশ্রয় ছেড়ে রাত্রির আকাশে উড়ে যায়।

ভিতরে তাকাই, ভাবি
যা হলে সবাই খুব খুশি হত, যা হলে সমস্ত দিক রক্ষা পেত, আজ
কালবৈগুণ্যের ফলে
এক-একটি কবিতা যনে কিছুতেই তেমন হচ্ছে না।
বাহিরে তাকাই, দেখি
হলুদ-সবুজ-লাল হলুদ-সবুজ-লাল
ট্রাফিক-বাতির ত্রিনয়ন

জ্বলছে নিবছে জ্বলছে নিবছে। অথচ কোথাও
কোন যানবাহনের চিহ্ন নেই।

ফুটপাতে ভিখারি নেই। রাস্তাগুলি খাঁখাঁ করছে। প্রধান গির্জার
গা বেয়ে জ্যোৎস্নার ধারা নেমেছে ফুটপাথে।
তারই মধ্যে একদিকে নিরন্তর
ট্রাফিক-বাতির দণ্ড চৌমাথায় চোখ মারে। অন্য দিকে
বঙ্গোপসাগর থেকে হুহু করে ছুটে আসে হাওয়া;
মধ্যরাতে
আচমকা কাঁপিয়ে দেয় কলকাতার বুকের পাঁজর।

কলঘরে চিলের কান্না

এখনও তোমার সেই ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পাই;
এখনও তোমার সেই দারুন বিলাপ
কানে বাজে।
গগণবিহারী চিল,
খর দীপ্র দুপুরবেলায়
তুমি এক আকাশের থেকে অন্য আকাশের দিকে
তেজস্বী ও স্বভাবত-সঙ্গিবিহীন সম্রাটের মত
সহজ উল্লাসে
বাতাসে সাঁতার কেটে চলেছিলে।
যেতে যেতে,
শূণ্যের মেখলা থেকে যে-রকম উল্কা খসে যায়,
তুমিও সহসা সেইরকম

ঊর্ধাকাশ থেকে এই গৃহস্থবাড়ির বারান্দায়
ছিটকে পড়েছিলে।

মুহূর্তে কাকের মেলা বসে গেল ছাতের কার্নিসে।
কা-কা-অট্টহাসির বিদ্রুপে
ভরে উঠল দ্বিপ্রহর।
তখনও মরোনি তুমি। দুই চক্ষু
ঘোলাটে ও ঘূর্ণমান, বাদামি শরীর
কেঁপে কেঁপে উঠছে, ফের আকাশে উঠবার
শক্তি নেই, তবু তুমি
শরীরের শেষ বিন্দু সামর্থ্য সংগ্রহ করে
প্রাণপণে ঝাপটাচ্ছ ডানা, কখনও-বা
বাঁকিয়ে উদ্ধত গ্রীবা
ঘৃণাভরে দেখে নিচ্ছ
অদূরে অপেমাণ শত্র"দের।
গগণবিহারী চিল! যারা ঊর্ধে উঠতে পারে না, আর
পারে না বলেই যারা
পৃথিবীর
ভাগাড়ে ও আস্তাকুড়ে কাপুরুষ মস্তানের মত
দঙ্গল পাকিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাদের
হাতে কি কখনও আমি ঊর্ধাচারী মানুষের
লাঞ্ছনা দেখিনি?
দেখেছি অসংখ্যবার। বুঝেছি যে, লাঞ্ছনাই স্বাভাবিক।
এমন কী, লাঞ্ছনা আর নিগ্রহের ফলে
মানুষের দীপ্তি ও মহিমা আরও বেড়ে যায়।

অথচ সমস্ত দেখে, সমস্ত বুঝেও- মূর্খ আমি-
দলবদ্ধ কাকের গুন্ডামি থেকে
তোমাকে বাঁচাতে গিয়েছিলুম। তোমকে
বারান্দার থেকে তুলে এনে
স্নানঘরের মধ্যে আটকে রেখে
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবতে পেরেছিলুম, তোমার
মর্যাদা বাঁচানো গেল।

এখন বুঝতে পারি, বস্তুত তোমাকে
এক বিদ্রুপের থেকে আরও ক্রুর, আরও ভয়ংকর
বিদ্রুপের ভিতরে নিক্ষেপ করেছিলুম সেদিন।
গগণবিহারী চিল,
বৈদুর্যমণির তীব্র দাহনে উজ্জ্বল খর দুপুর বেলায়
সম্রাটের মতো তুমি সমস্ত আকাশ ঘুরে এসে
তারপর
শহরতলির এক গৃহস্থের
ছয় বাই তিন ফুট ওই কলঘরের অন্ধকারে বন্দি হয়েছিলে।
সারারাত্রি ঝাপটা মেরেছ তুমি
কাঠের দরজায়,
নখরে আঁচড়েছ মেঝে, সারারাত
আপন সাম্রাজ্য থেকে নির্বাসিত, বিচ্যুত হবার
অপমানে, গ্লানিতে ও যন্ত্রণায়
চিৎকার করেছ।

অমন ধারালো, শুকনো, বুকফাটা আর্তনাদ আমি
কখনও শুনিনি।
এনে হয়েছিল, যেন পাখি নয়, বিশ্ব-চরাচর
আজ রাত্রে ওই
কলঘরের অন্ধকারে বন্দি হয়ে চিৎকার করছে।
গগনবিহারী চিল,
সকালে তোমাকে আমি মুক্তি দিব বলে
দরজা খুলে যখন দেখলুম,
মেঝের উপর তুমি স্থির ও নিঃশব্দ হয়ে পড়ে আছ,
তখন আবার মনে হয়েছিল,
তুমি পাখি নও, তুমি অফুরন্ত আকাশের প্রাণমূর্তি, যেন
সমস্ত আকাশ আজ
নিতান্ত ছাপোষা এক গৃহস্থের
কলঘরের
ক্লিন্ন অন্ধকারে
মরে পড়ে আছে।

১৯ ফাল্গুন, ১৩৭৬

জোড়া খুন

লোভ আমাকে অরণ্যের দিকে টেনে আনে।
তারপর
অচেনা সেই অরণ্যের মধ্যে
ভয় আমাকে দিগ্বিদিকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়।
আমি ঠিক করেছিলুম,

আমার এই যুগল-শত্রুকে আমি শেষ না করে ছাড়ব না।
আগে আমি লোভের মরামুখ দেখব।
তারপর ভয়ের।

কিন্তু দ্যাখো, কী আশ্চর্য,
লোভের গলায়
আমার দীর্ঘ ও শাণিত ছুরিখানাকে আমূল বিঁধিয়ে দিয়ে
যেই আমি চেঁচিয়ে বলে উঠেছি,
"কিছুই আমি চাই না,"
ভয়ও অমনি, চুপসে-যাওয়া একটা বস্তার মতো, আমার পায়ের তলায়
লুটিয়ে পড়ল।

কখন আলো ফুটেছে, আমি জানি না।
আমি শুনতে পাচ্ছি,
দূর থেকে ভেসে আসছে সূর্যোদয়ের গান।
উদ্দীপক সুরার মতো
সেই গানের সুর ছড়িয়ে যাচ্ছে আমার রক্তে।
শরীরটা খুব হালকা লাগছে।
মনে হচ্ছে,
একটা মস্ত বড় ব্যাধির থেকে আমি মুক্ত হয়ে উঠলুম।

আমার সামনে ছিল লোভ।
আমার পিছনে ছিল ভয়।
আমি ভেবেছিলুম,

একে-একে আমি তাদের মোকাবিলা করব।
কিন্তু তার আর দরকার হল না,
একজনকে আক্রমণ করবার সঙ্গে-সঙ্গেই দেখতে পেলুম,
অন্যজনও ফতুর হয়ে গেছে।

আবিরের থালা হাতে নিয়ে আকাশ আমার মুখ দেখছে।
পাখিরা আমার বন্দনা গাইছে।
বৃক্ষ ও লতা বাতাসে নত হয়ে
নমস্কার করছে আমাকে।
জোড়া খুনের সমাধা করে, বাঁ পা এর লাথি মেরে
আমার দুই জন্মশত্রুর মৃতদেহকে একটা নালার মধ্যে ঠেলে দিয়ে
শিস দিতে দিতে
অরণ্য থেকে আমি বেরিয়ে এলুম।

না এলে না-ই বা এলে

না এলে না-ই বা এলে, তাই বলে কি এ-জন্মে আমার
পরিত্রাণ নেই?
তুমি যত ধোঁকা দাও, তুমি যত
চালাক মাছের মতো দূরে-দূরে ঘোরাফেরা করো,
আমারও ততই
জেদ বেড়ে যায়, আমি
শব্দনির্বাচনে তত সতর্ক হবার চেষ্টা করি।

ডাইনে-বাঁয়ে জমে আছে শব্দের পাহাড়। আমি
একদিকে থেকে একটি ইচ্ছুক পাথর তুলে এনে–

যে-রকম জুতো জামা ইত্যাদির মিলন ঘটানো হয়
সেইরকম–
অন্য পাথরের সঙ্গে তার
জোড় মেলানোর চেষ্টা করি,
ক্রমাগত ক্রমাগত চেষ্টা করি।
কিন্তু জোড় কিছুতে মেলে না।

তুমি একবার মাত্র হাতের মুঠোয় এসেছিলে
সুদূর শৈশবে;
তারপর একবারও এলে না।
যেমন আকাশ থেকে কবুতর মাটিতে, অথবা
দূর অরণ্যের ফুল বারান্দার টবের চারায়
দৈব নিয়মের মতো প্রতিদিন
নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসে, সেইরকম আর
একবারও এলে না তুমি।

না এলে না-ই বা এলে, তাই বলে কি বিকল্পে আমার
পরিত্রাণ নেই?
সম্প্রতি দু'বার আমি দূর থেকে তোমাকে দেখলুম।
একবার আগ্রার এক ভগ্ন মিনারের শীর্ষে সন্ধ্যার আগুনে,
একবার পুরীর
দীপ্র মকরক্রান্তি তরঙ্গমালায়।
দেখলুম, এখনও তুমি একাধারে
হরিচন্দনের মত জলন্ত এবং
জলজ পুষ্পের মতো কমনীয় রয়ে গেছ। সেই

মুখশ্রী আমি
শব্দের ভিতর ধরে রাখতে চাই, আমি
শব্দে-শব্দে তাই জোড় বাঁধতে চাই, তবু
বাঁধতে পারি না।
অথচ নিশ্চিত জানি, রক্ত ও মাংসের সেই মূর্তিকে যদি না
হাতে পাই, তবে তাকে শব্দের ভিতরে
সমূহ ফোটাতে হবে, না-ফোটালে এ-জন্মে আমার
পরিত্রাণ নেই।

রক্তপাত, পড়ন্ত বেলায়

আজকের মতো খেলা তো প্রায়
খতম হতে চলল।
আর মাত্র মিনিট পাঁচেক বাকি।
যাও বাছা, মাঠে গিয়ে
এই পাঁচটি মিনিট তুমি কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে থাকো।

চেয়ে দ্যাখো,
আলো পড়ে এসেছে।
চেয়ে দ্যাখো,
ওদের বোলারদের চোখ।
লোভে চকচক করছে।
মনে হচ্ছে, ওদের তেষ্টা এখনও মেটেনি।
মনে হচ্ছে,

এই শেষবেলায় ওরা অন্তত আর-একজনের
রক্ত না-দেখে ছাড়বে না।

বলো, আমার নামজাদা ব্যাটসম্যানদের
কাউকেই কি এখন আমি
মাঠে পাঠাতে পারি?
আজকের মতো তারা বেঁচেবর্তে থাক।
সকাল হোক
রোদ্দুর উঠুক,
তখন তারা খেলা দেখাবে।

তুমি যাও।
তুমি গিয়ে ওদের তেষ্টা মেটাও।
তুমি আমার এগারো-নম্বর খেলোয়াড়;
কিন্তু প্রমোশন দিয়ে তোমাকে আমি
তিন-নম্বরে তুলে আনলুম।
তোমার স্বার্থে নয়,
দলের স্বার্থে।

বাছা, তুমি ধরেই নাও যে, এই পড়ন্ত বেলায়
দলের স্বার্থে তোমাকে আমরা
খুন হতে পাঠাচ্ছি।

স্বপ্নে-দেখা ঘরদুয়ার

পুকুর, মরাই, সবজি-বাগান, জংলা ডুরে শাড়ি,
তার মানেই তো বাড়ি।
তার মানেই তো প্রাণের মধ্যে প্রাণ,
নিকিয়ে-নেওয়া উঠোনখানি রোদ্দুরে টান্-টান্।
ধান খুঁটে খায় চারটে চড়ুই, দোলমঞ্চের পাশে
পায়রাগুলো ঘুরে বেড়ায় ঘাসে।
বেড়ালটা আড়মোড়া ভাঙছে; কুকুরটা কান খাড়া
করে শুনছে, কথা বলছে কারা।
পুবের সূর্য পাশ্চিমে দেয় পাড়ি,
দুপুরবেলার ঘুমের থেকে জেগে উঠছে বাড়ি।
লাঠির ডগায় পুঁটলি বাঁধা, অনেকটা পথ ঘুরে
লোকটা যাচ্ছে দূরের থেকে দূরে।
ওর চোখেও কি এমন একটা বাড়ির স্বপ্ন টানা?
ওর মনেও কি গন্ধ ছড়ায় গোপন হাস্নুহানা?
ও বড়বউ, ডাকো, ওকে ডাকো,
ওই যে লোকটা পার হয়ে যায় কাঁসাই নদীর সাঁকো।

হ্যালো দমদম

আমার হাতের মধ্যে টেলিফোন;
আমার পায়ের কাছে খেলা করছে
সূর্যমণি মাছেরা।
পিচ-বাঁধানো সড়কের উপর দিয়ে
নৌকো চালিয়ে আমি

পৃথিবীর তিন-ভাগ জল থেকে এক-ভাগ ডাঙায় যাব।
সেই নৌকোর জন্যে আমি বসে আছি;
আর, পাঁচ মিনিট পরপর
ডায়াল ঘুরিয়ে চিৎকার করছি:
হ্যালো দমদম...হ্যালো দমদম...হ্যালো...

আমার মাথার উপরে জ্বলছে নিয়ন-বাতি;
আর আমার গোড়ালির চারপাশে চক্কর মেরে
হাঁটুর কাছে উঠে আসছে
মোহেনজোদড়োর নর্দমা থেকে উপচে-পড়া নোংরা কালো জলস্রোত।
আমার দেওয়ালে ফুটেছে সাইকেডেলিক ছবি।
সেই ছবির দিকে তাকিয়ে আমি ভাবতে থাকি যে,
আমার জুঁইলতা এখন
পাঁচ ফুট জলের তলায় ফুল ফোটাচ্ছে।

কিন্তু খুব-বেশি ভাবনা-চিন্তার সময় আমি পাই না।
আচমকা
আমার মনে পড়ে যায় যে,
দমদম-থানা থেকে একটা রেস্‌ক্যু-বোট আসবে।
সেই প্রতিশ্রুত উদ্ধারের জন্য পুনশ্চ আমি চেঁচাতে থাকি;
হ্যালো দমদম...হ্যালো দমদম...হ্যালো...

জল ঠেলে আমি শোবার ঘরে আসি।
জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে আমার মেয়ের গা।
তার টেম্পারেচার নিয়ে, জল ঠেলে, আমি আবার

টেলিফোনের কাছে ফিরে যাই।
সেই অবসরে, দরজা খোলা পেয়ে,
রাজ্যের কচুরিপানা ও একটা নেড়িকুত্তা
সাঁতার কেটে
আমার ড্রইংরুমে এসে ঢোকে।

আমি বিস্মিত হই না।
কচুরিপানার ফুলগুলিকে আমি ফ্লাওয়ার-ভাসে সাজিয়ে রাখি,
এবং নেড়িকুত্তাটিকে খুব যত্ন করে আমার
সোফার উপরে বসাই।
তারপর টেলিফোনের মাউথপিসটাকে
তার মুখের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলি,
"যদি বাঁচতে চাস হারামজাদা
তা হলে আয়, আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বল:
হ্যালো দমদম...হ্যালো দমদম...হ্যালো..."